বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার
মুখপত্র

প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংকলন
মে-জুন, ১৯৭৮

দাম : ৫০ পয়সা

● Repression on Scientists in Argentina—২ ● বেঙ্গল ইমিউনিটি কি উঠে যাবে?—৪
● জনমানসে বিজ্ঞান প্রচার—৬ ● ভারতবর্ষে ঔষধশিল্পের গবেষণা—৮ ● সংবাদ—১২ ● চিঠিপত্র—১৫

সম্পাদকীয়

বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আইনগত নিরাপত্তার অভাব প্রসঙ্গে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'-র দ্বিতীয় সংখ্যায় আমরা আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম। 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্কাধীন বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মীদের চাকুরীগত (আইনী) নিরাপত্তার অভাব যেহেতু স্বাভাবিক কাজকর্মের অগ্রগতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই এর আশু সমাধান অত্যন্ত জরুরী। বিজ্ঞান কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস ছাড়া তা হওয়া সম্ভব নয়। অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা যে অবিধিবদ্ধ স্বয়ংশাসিত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলোর চলতি শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া দূর করবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবাংলায় একটি যৌথ আন্দোলন কমিটি ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা সে আন্দোলনের অংশীদার। সমস্ত রকমের সঙ্কীর্ণতা ও বিভেদপ্রবণতার উর্দ্ধে উঠে এ ব্যাপারে বিজ্ঞান কর্মীদের সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে যেতে সংস্থা দৃঢ়সঙ্কল্প ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পত্রিকার গত সংখ্যায় ভারতবর্ষের ঔষধশিল্পের সমস্যা, বিশেষত বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের আধিপত্য ও দেশীয় শিল্পের ক্রম-অবক্ষয় প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি ভারত সরকার ঔষধ সংক্রান্ত নীতি ও বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন করেছেন—যদিও 'হাতি কমিটি'-র সুপারিশগুলি কার্যত অগ্রাহ্য হয়েছে। প্রসঙ্গত অবশ্যই বলা দরকার যে বাস্তবক্ষেত্রে মূল সমস্যা সমাধানে যে ব্যাপক ও মৌলিক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন ঘোষিত পরিবর্তনগুলো তার তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। এই মন্তব্যের সারবত্তা প্রতিপন্ন হবে বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত 'বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী'র সাম্প্রতিক সংকট প্রসঙ্গে লেখাটি থেকে।

নন্দাদেবী শৃঙ্গে দেশী-বিদেশীচক্রের বিজ্ঞানের অপব্যবহারমূলক যে চাঞ্চল্যকর ক্রিয়াকলাপ সম্প্রতি ফাঁস হয়ে পড়েছে তার যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবন করতে আমরা সমস্ত স্তরের বিজ্ঞানকর্মী ও জনগণের কাছে আবেদন করছি। বিষয়টিকে জনবিরোধী আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা বলে আমরা মনে করতে পারিনা। ভারতীয় জনগণের জীবন ও স্বাস্থ্যের ওপর এর কোন দীর্ঘমেয়াদী বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব কিনা তাও অবশ্যই আমাদের পৃথকভাবে বিচারবিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। বৈজ্ঞানিক (অর্থ নৈতিক) পরনির্ভরতা কিভাবে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের দরজা খুলে দেয় ঘটনাটি নিঃসন্দেহে তারই নির্ভুল নিদর্শন। দেশী-বিদেশী শাসকগোষ্ঠি ও তাদের পোষা গোলাম 'বিজ্ঞানী'দের এ ধরণের মানবতাবিরোধী জঘন্য ক্রিয়াকলাপের আমরা তীব্র নিন্দা করি এবং সাথে সাথে সৎ বিজ্ঞানীদের এ ধরণের দুরভিসন্ধিমূলক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সচেতন হতে আহ্বান জানাই।

॥ **ত্রুটি স্বীকার** ॥ 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র পূর্ববর্তী (৫ম) সংখ্যায় প্রকাশিত ঔষধশিল্পের সমস্যা-সংক্রান্ত লেখা প্রবন্ধটির লেখকের নাম (নীলোৎপল ভট্টাচার্য) ভুলক্রমে ছাপা হয়নি। এ অসতর্কতাজনিত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। সম্পাদকমণ্ডলী, 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'

Repression on Scientists in Argentina

[আর্জেন্টিনায় মিলিটারী শাসন চালু হওয়ার পর থেকেই বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন চলছে। বিজ্ঞানকর্মীদের বিশ্ব-সম্মেলনে সভাপতি ই. এইচ. এস. বারহপ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বিষয়টি সবিস্তারে তুলে ধরেন। সে সংক্রান্ত রিপোর্টেরই সংক্ষিপ্তসার বর্তমান লেখাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। লেখাটি রচনায় "Science for the People" পত্রিকার জুলাই-আগষ্ট ('৭৭) সংখ্যা থেকে প্রচুর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। —সম্পাদক]

In his opening address to the 11th general assembly of the World Federation of Scientific Workers, the president of the executive council of W. F. S. W., Prof. E. H. S. Burhop pointed out that "in some countries political tensions and conflicts have led to attacks on scientists and academics and the dismantling of University departments of a kind that has not been seen since the jackboot of Hitler Nazism destroyed the finest traditions of German liberal and scientific culture." He was there mentioning attacks on Science and Scientists, particularly in a number of Latin American Countries. Following Chile and Uruguay, Argentina is now experiencing the wave of repression by a military junta.

After the coup against the 1974-76 Government of Isabel Peron, Argentina is now under the rule of a rightwing military junta that took power last March 1976. Since then the military is waging a war against the Argentinan people on two fronts: economic and political. Economically the agro-export sector is developed favouring the landed oligarchy that owns land and ranches. The country's doors have been opened to multinational companies such as I. T. T, Exxon and U. S. Steels. As a result of the existing economic policies like freeze on wages and establishment of free market prices, Argentinan workers have had their real wages reduced by 60% in one year. Hours of daily labour to meet the basic needs of the family have risen from six to eighteen. Unemployment is at an unprecedented height. Implementation of these policies has required political repression of all sorts : restrictions on workers' assemblies and on strikes, reprisals against armed popular resistance by groups, and the dismissal, exile or imprisonment and massive killing of many union activists, professionals, scientists and technical workers. According to Rodolfo Walsh, a kidnapped journalist, the statistical accounts of this kind of terror are, "15,000 people missing without any trace, 10,000 prisoners, 4000 dead and tens of thousands of exiles."

Argentina has more scientists, university professors, technicians, educationists, and cultural workers than most other Latin American nations In this vast segment of people, the military junta finds roots of the ideology subversive to the existing order. So total eradication of this ideology is the only way left to the rulers.

Searches, seizures and burning of books and publications considered incompatible with "traditional, spiritual and cultural values synthesized in God, country and home" have been conducted. At the Universidad Nacional de Cuvo about ten thousand books were seized from homes of professors and students of the University. Not only is the reading of Marx's works a crime under the statutes of the law of repression and terrorism, university policy

now decrees that "the works of Freud, Piaget and others are prohibited from being used as assigned material or being included as bibliographical references." Teaching of the courses on psychology psychiatry and psychoanalysis is prohibited More than 200 university employees and 700 scientists in research institutions and other important educationists have been dismissed from jobs. Many of the vacancies created in this way have been filled by military officers. Hundreds of psychologists, psychoanalysts, physicians and social workers have been fired from their positions in hospitals and mental health institutions. Fascism thus seems to be fulfilling the promise of obliterating the cultural links of the nation very well.

The blessings of U.S. Govt. have made this powerful repression possible. U. S. Govt. and many U.S. agencies like Agency for International Development (AID) have granted millions of rupees and sophisticated technologies of repression to aid the Argentinan military force. I.B.M and other North American manufacturers sell modern computer systems which are used to store and make available information about political suspects. In Buenos Aires, the Federal police use electronic equipments so advanced that even the most modern North American police force have no comparable gear. An example is the Digicon system. It is a communication system connecting patrol cars, dispatchers aud security data base system. Video terminals are located in each patrol car which can display information from the data base about the possible suspects the patrol officers may happen to pick up on the street. Many other examples may be cited to show the most modern use (?) of science in this repression. Thus it is easy to understand why Argentina has relocated itself in the US sphere of influence. Also these simply remind us of the horrible Frankenstine story that scientists are becoming victims of the machines they generate.

WOMEN POLITICAL PRISONERS' ACCOUNT OF PRISON CONDITIONS IN ARGENTINA

"The majority of the women are held at the disposition of the P. E. N. (executive power) and the rest are awaiting justice before course military and police processes. We arrive at the prison after the required stage of torture chamber at the Federal Coordination Centre, police stations, military barracks, etc., located throughout the country : days or months submitted to torture with the electric picana (prod), suffocation by immersion, raped by torturers or by mechanical means, the introduction of rats and spiders into our vaginas, bitten by dogs, watching our relatives or companions die by tortures, losing their children in their wombs. Handcuffed, blindfolded, humiliated, we arrive at the unit 2 to begin another stage of suffering. While under the regime of Decree 2023/74, the illegality of our situation comes to such a point that we are not even allowed to read it, an aberration of justice. Thus our lives are ruled by a law which we are not allowed to read."

"Science for the People" vol 9 No. 4 July-Aug. 1977.

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৭শে মে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিদ্যা বিভাগে বেলা ২টায় অনুষ্ঠিত হবে।

বেঙ্গল ইমিউনিটি কি উঠে যাবে ?

[The Bengal Immunity Company, one-time a pioneering indigeneous enterprise in the pharmaceutical industry in West Bengal is now practically on the verge of collapse. The author held talks with the representatives of workers of this company in order to collect some first-hand informations about the nature and extent of the crisis in this company. The article presents the latest situation in the company and attempts to analyse the root cause of the problem which, according to the author, lies, in the main, in the pursued policies of the State and Central Governments. The article is to be read and discussed in the context of the Government's recently introduced changes in the drug policies. —Editor]

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি এপ্রিলের শেষ থেকে বন্ধ হয়ে যেতে পারে শুনে 'অন্য অর্থ' পত্রিকার তরফ থেকে কয়েকজন বন্ধু ঐ কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মী নিয়ে গঠিত যুক্ত সংগ্রাম কমিটির মুখপাত্রদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাঁদের সৌজন্যে আমিও সেই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলাম। কর্মীদের মুখপাত্ররা যা বললেন তা থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার একটা প্রাথমিক ধারণা হয়েছে। তাঁরা কোম্পানির সংকটের জন্য দায়ী করছেন কোম্পানির কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য অবহেলা আর দুর্ব্যবস্থাকে। আমার মনে হলো এটা সংকটের আশু কারণ হলেও চূড়ান্ত কারণ নিহিত রয়েছে আমাদের দেশে ওষুধ শিল্পের গঠন আর সে সংক্রান্ত সরকারী নীতির মধ্যে।

একটা উদাহরণ দিই। বেঙ্গল ইমিউনিটি (সংক্ষেপে বি. আই) আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরণের সিরাম (যা দিয়ে ডিপথিরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়) তৈরীর ক্ষেত্রে অগ্রণী বা, বলা যেতে পারে, একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৯৬৫ সাল নাগাদ কোম্পানি সিরাম তৈরীর জন্য প্রায় ৮০০ ঘোড়া পালন করতো। সরকারের কাছ থেকে কিছু সহযোগিতা পেলেই বি. আই একাই আমাদের দেশের প্রয়োজন অনেকটা মেটাতে পারতো। কিন্তু তার বদলে ভারত সরকার ঐ সময় থেকে বাইরের থেকে (রাশিয়া) সিরাম আমদানি করতে শুরু করলো। আমদানি করা সিরাম বারোজ ওয়েলকাম, ফিলিপস ইত্যাদি কয়েকটা কোম্পানীকে দেওয়া হয় টিকা হিসাবে বাজারে উপস্থিত করার জন্য (এক বছর ঐ সিরামের কিছু অংশ বি. আইকেও দেওয়া হয়েছিল)। ফলে বি. আই এর সিরাম উৎপাদন প্রচণ্ডভাবে মার খেল। বি. আই কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও কিন্তু সরকারকে চাপ দেওয়ার বা বাইরের থেকে সিরাম আমদানির চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার কোন চেষ্টা দেখা গেল না। কারণ সিরামের ক্রেতা সাধারণত হয় বিভিন্ন হাসপাতাল বা সরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, যাদেরকে প্রচুর 'ডিসকাউন্ট' দিয়ে কম দামে বিক্রী করতে হয়। ফলে এই ক্ষেত্রে 'প্রফিট' কম। তাছাড়া সিরাম উৎপাদনে যে অর্থ বিনিয়োগ করা হয় ওষুধ বিক্রী হয়ে তা ঘুরে আসতে সময় লাগে অন্যান্য ওষুধের তুলনায় বেশী। প্রথমত যে ঘোড়ার থেকে সিরাম তৈরী হয় তাকে পালন করতে হয় অন্তত তিন মাস, যে সময় তার থেকে কোন সিরাম পাওয়া যায় না। আর দ্বিতীয়তঃ হাসপাতালগুলো থেকে সিরামের দাম আদায় করতেও বেশ সময় লাগে। এর ওপর আবার রয়েছে ঘোড়ার নানারকম রোগ আর মড়কের ঝুঁকি। পশুচিকিৎসক নিয়োগ করে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ঘোড়ার পরিচর্যা করা ? তাতে ত বেশ কিছু টাকা ঢালতে হবে যা থেকে হাতে হাতে মুনাফা আসবে না। অতএব ও পথ নয় (কয়েক মাস আগে ২১টা ঘোড়া মারা গেল ; কিন্তু কি রোগে তারা মরলো সেটাও জানার বিশেষ চেষ্টা করা হয়নি)। ফলে আজ সিরামের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারতবর্ষকে বিদেশের ওপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে হয়েছে। মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন মহামারী প্রতিরোধের একমাত্র উপায় এই সিরাম। কয়েক বছর আগে বি. আই দেরাদুনে একটা নতুন ইউনিট চালু করেছিল, কিন্তু তাতে এখন মোটে ২৫০টির মত ঘোড়া রয়েছে আর কলকাতায় রয়েছে ১০০টির কাছাকাছি। চেষ্টা করলে বি. আই বছরে ১০,০০০ মেগাইউনিট এ.টি. এস (ধনুষ্টঙ্কারের প্রতিষেধক) তৈরী করতে পারে, সারা দেশে বর্তমানে মোট চাহিদা যেখানে ১২,০০০ মেগা ইউনিট। সে জায়গায় বি. আই এখন উৎপাদন করছে মাত্র প্রায় ৩,৫০০ মেগাইউনিট। বি. আই বন্ধ হয়ে গেলে এটুকুও আর দেশে তৈরী হবে না।

একই কাহিনী ক্লোরোকুইনের মতো 'বেসিক ড্রাগ' এর বেলায়ও। এটা কম গর্বের কথা নয় যে আমাদের দেশের কর্মীরা নিজেদের প্রচেষ্টায়

বি. আইতে এই ওষুধ তৈরীর প্রণালী বের করে উৎপাদনের প্ল্যান্ট বসিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী নীতিতে তার স্বীকৃতির লক্ষণ দেখা যায়নি। বিদেশ থেকে ক্লোরোকুইন আমদানির ওপর কার্যকর কোন বিধিনিষেধ না থাকায়, আর বি. আইকে কোনরকম ভরতুকি দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায়, বি. আইকে ঐ প্ল্যান্ট বন্ধ করে দিতে হয়েছে। আমদানি করা ওষুধের দাম এক্ষেত্রে বি. আইতে তৈরী ওষুধের থেকে কিছু কম ছিল। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে উৎপাদনের প্রাথমিক স্তর আর তার দরুণ উদ্ভূত অসুবিধাগুলো কাটিয়ে বি. আই তখনও নিয়মিত বৃহদায়তন উৎপাদনের স্তরে যেতে পারেনি, বিদেশী কোম্পানিগুলো যে স্তরে অনেক আগেই চলে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত সরকারেরই যা অবশ্যপালনীয় নীতি তা হলো দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ বা 'প্রোটেকশন'। কর্মীদের মুখপাত্রদের সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হলো যে এক্ষেত্রে 'প্রোটেকশন' এর কোন চেষ্টা হয়নি। এখানে একটা কথা মনে করা যেতে পারে। বিদেশে যে সব পণ্য রপ্তানি হয় সেগুলো যাতে বিদেশী ক্রেতাদের কম দামে (অনেক সময় আন্তর্জাতিক বাজারদরের চাইতেও কম দামে) দেওয়া যায় তার জন্য সরকার থেকে সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলোকে প্রচুর ভরতুকি দেওয়া হয়। বলা হয়ে থাকে যে বিভিন্ন ধরণের 'অপরিহার্য' পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করার বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য এই ব্যবস্থা। অজ্ঞজনেরা প্রশ্ন করে থাকেন যে এই ভরতুকি দেশীয় চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদনরত বিভিন্ন শিল্পে দিলে কি ঐসব অপরিহার্য পণ্যের আমদানি অনেকটাই এড়ানো যেতো না? বি. আই এর দৃষ্টান্ত থেকে আমার মনে হলো যে তথাকথিত অজ্ঞজনদের এই ধরণের চিন্তাই বোধ হয় দেশীয় স্বার্থের পক্ষে সত্যিকারের অনুকূল। বি. আই এর সংকট প্রসঙ্গে কর্মীদের তরফ থেকে যে সমস্ত তথ্য আর মন্তব্য আমাদের সামনে রাখা হলো, যার দুটো দৃষ্টান্ত আমি ওপরে উল্লেখ করলাম, তা থেকে নিচের সিদ্ধান্তগুলোয় আসতে বোধ হয় কোন কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন হয় না।

(ক) বিদেশী ভেষজশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী স্বার্থগুলো ভারতবর্ষের মতো বিশাল বাজারে ক্রমশঃ বেশী করে অনুপ্রবেশ করতে সর্বদাই উন্মুখ।

(খ) তাদের চাপেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক সরকার তাদের বিপরীতে দেশীয় শিল্পকে সত্যিকারের সাহায্য করা দূরে থাক, পরোক্ষভাবে দেশীয় শিল্পেরই বিপরীতে তাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করছে।

(গ) 'পশ্চাৎপদ' দেশ ভারতবর্ষে 'দেশীয়' শিল্পের মালিকদের অন্তত একটা অংশ এই পরিস্থিতিতে বিদেশী স্বার্থ আর তার সহায়কদের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বদলে আত্মসমর্পনই শ্রেয় বলে মনে করে। এমনকি এর জন্য কোম্পানি বন্ধ করে দিতেও তারা পিছপা নয়। কারণ বন্ধের বিরোধিতা করতে হলে যা প্রয়োজন তার নাম হলো লড়ে যাওয়ার মনোবৃত্তি। আর তা বোধ হয় এদের নেই।

বি. আই কোম্পানি যে বাঙালী পরিবারটির নিয়ন্ত্রণাধীন তারা কোম্পানিতে তাদের বিনিয়োগ করা অর্থের অনেকগুণ মুনাফা ইতিমধ্যেই অর্জন করে নিয়েছে। আজ থেকে ৫৯ বছর আগে নীলরতন সরকার, বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটা দেশীয় প্রতিষ্ঠান উঠে গেলে তাদের হয়তো খুব বেশী কষ্ট হবে না। অবশ্য কেবল কর্মীরাই নয়, কোম্পানির মালিকপক্ষও সরকারকে কম্পানির দায়িত্ব অধিগ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন। ২০০০ এরও বেশী কর্মীর ভবিষ্যৎ যেখানে জড়িত অধিগ্রহণ সেখানে অবশ্যই কাম্য।* এই ২০০০ কর্মীর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ত বটেই, দেশের মানুষের দাবী তার চাইতে আরও অনেক বেশী। এই দাবী মেটানোর প্রধান পূর্বশর্ত হলো নতুন অধিগ্রহণকারীদের মনোভাব পূর্বতন মালিকশ্রেণীর মনোভাব থেকে সত্যিই আলাদা হওয়া—তাঁরা যেন দেশের মানুষের স্বার্থে দেশীয় শিল্পের স্বনির্ভর উন্নয়নকে সত্যিই অগ্রাধিকার দেন। এই পূর্বসর্ত এখন পর্যন্ত পালিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

---

* ৪-৫-৭৮ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পবাণিজ্য মন্ত্রী বলেছেন 'বেঙ্গল ইমিউনিটি'র পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নেবেন।

['অন্য অর্থ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী জানালেন যে ঐ পত্রিকার আগামী সংখ্যায় 'পূর্বভারতের দেশীয় ঔষধশিল্পের অবক্ষয়' প্রসঙ্গে একটা বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে। পাঠককে প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।]

অভিজিৎ লাহিড়ী

জনমানসে বিজ্ঞান প্রচার

The article deals with the problems and methods of dissemination of scientific ideas and of popularisation of science amongst the vast masses of our population. May be, the causes of the problems have not been analysed here in-depth or in their totality. But it certainly represents the viewpoint of a section of our readers. The article is published with a view to initiating a meaningful discussion on and around this very important topic. Further comments and articles on this issue are invited. —Editors

আজকের দিনে জীবনধারণের প্রতি ক্ষেত্রেই মানুষকে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। জীবনধারণের মান উন্নয়ন, সমাজ পুনর্গঠন এবং দেশোন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রধানত বিজ্ঞান ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। জনসাধারনের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা যতই উন্মেষিত হয়, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ততই হয় সার্থকভাবে রূপায়িত। ইতিহাসতো তাই বলে।

উন্নত দেশগুলির সাধারণ মানুষ এদেশের তুলনায় অনেক বেশি শিক্ষিত এবং বিজ্ঞানসচেতন। সেদেশের সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের মানও অনেক উন্নত। সেখানকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা তাই সহজেই সফলতা লাভ করে।

জনজীবনে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের সম্যক পন্থা হিসাবে এদেশে সাধারণত জনগণের মাতৃভাষার মাধ্যমে পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ এবং জনপ্রিয় বক্তৃতা আয়োজনের কথাই এখনও ভাবা হয়ে থাকে। তার সঙ্গে কখন কখন স্থান পায় সীমিত মাত্রার কিছু সংখ্যক উদ্দেশ্যহীন বিজ্ঞান প্রদর্শনী। কিন্তু, এই সমস্ত পন্থা আমাদের দেশে, যেখানে জনসাধারণের শতকরা ষাট ভাগেরও বেশি নিরক্ষর, তাদের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা উন্মেষে কোনমতেই যথেষ্ট হতে পারে না। উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলি কেবলমাত্র আক্ষরিকদের কিছুটা বিজ্ঞানমুখী করে তুলতে পারে। এগুলি তাঁদের বিজ্ঞান-চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক—সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু নিরক্ষরদের বিজ্ঞান মানসিকতা কিভাবে উন্মেষিত হবে? অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন বিজ্ঞানকর্মী হিসাবে কাজ করে। দেখা যায়—টিউবওয়েল, জল সরবরাহ, রাস্তা তৈরি, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম তৈরি, রেডিও তৈরি প্রভৃতিতে এবং কলকারখানার বিভিন্ন বিভাগের নানান কাজে বহু কর্মী দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে থাকেন; কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরির ক্ষেত্রে, চাষাবাদে এবং অন্যান্য বহু কাজে অনেক কর্মী আছেন যাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বদলে নিজস্ব নিয়মে নিখুঁতভাবে কাজ করে থাকেন। তাঁদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিখবার প্রধান অন্তরায় নিরক্ষরতা ও যথাযথ শিক্ষণের অভাব। আমাদের কৃষিভিত্তিক দেশে চাষাবাদে বৈজ্ঞানিক শিক্ষণের অভাব যে কতটা তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্য দিকে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রচলন করবার সরকারী ও বেসরকারী সবরকম প্রচেষ্টা একত্রে চাষীদের চাষবাস সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার পাঁচ শতাংশও মেটাতে অক্ষম। বিভিন্ন চাষের জন্যে জমির মাটি পরীক্ষা করে যথাযথ ভাবে সার নির্ধারণ ও প্রয়োগ, উপযুক্ত বীজ নির্বাচন, সেচ-ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রকার কীটের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হওয়া উচিত, তা হয় না। সবই আন্দাজের উপর ভিত্তি করে চালানো হয়—যদিও কয়েক বছর ধরে ব্যাপক ভাবে নানারকম জৈব ও অজৈব সার, কীটনাশক ওষুধ, গভীর ও অগভীর নলকূপ প্রচলিত হয়েছে। সরকারী সীমিত প্রচেষ্টা এবং চাষীদের এ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগ-কৌশল সম্পর্কে ধারণার অভাবই এর অন্যতম কারণ। তাই তাঁরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে সাধারণ আধাজ্ঞানী ডাক্তারদের 'ব্রড্ স্পেকট্রাম এন্টিবায়োটিকস্' প্রয়োগ করার মত করে কাজে লাগিয়ে কিছু কিছু ফল পেয়েই খুশি থাকেন।

এ জাতীয় বিভিন্ন পেশার কর্মীরা যদিও বিজ্ঞান কর্মী—বিজ্ঞানের মূল কথার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হলে তাঁরা আরও কুশলী কর্মী হিসাবে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এজন্যে প্রয়োজন নিয়মিত বিজ্ঞান শিক্ষণ ও চর্চা, দৈনন্দিন প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞানের চার্ট ও মডেল প্রদর্শনীর আয়োজন, বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মান, স্লাইড সহযোগে বক্তৃতার আয়োজন এবং ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে জনজীবনের প্রয়োজন সম্পর্কীয় বিজ্ঞানভিত্তিক গণশিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে বিজ্ঞানের নীতি বিশ্লেষক মডেল ও চার্ট প্রয়োজন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মডেল শুধুমাত্র বিজ্ঞানের অভাবনীয় অবদানের পরিচয় দেবে না—দেবে প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞানের সংগে পরিচয় ঘটিয়ে। আরও প্রয়োজন বিজ্ঞানের সংগ্রহশালা। সেখানে সাধারণের উপযোগী ভাল মডেল থাকবে এবং তা প্রদর্শিত হবে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার

পাঠক্রম ও বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যার প্রয়োগ সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানসচেতনতা জাগাবে এবং শিক্ষার প্রতি তাঁদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। আজকাল রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে জনমানসে বিজ্ঞান প্রচারের চেষ্টা চলছে। কিন্তু দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনের তুলনায় তা কি খুবই নগণ্য নয়? নিয়মিত টেলিভিশন দেখাটাও সাধারণ লোকের কাছে অভাবনীয়। বিজ্ঞান প্রচারে বিষয়বস্তু নির্বাচন সবসময় যথোপযুক্ত হয় না। বিজ্ঞান প্রচারের বিষয় বস্তুগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অভাবনীয় অবদানকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়ে থাকে। এগুলি উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কাছে আনন্দ বা সামান্য জ্ঞানের খোরাক জোগালেও সাধারণ লোকের কাছে, যাঁদের বেশি অংশই নিরক্ষর, তা ম্যাজিকের মত মনে হয়। এর সাহায্যে তাঁদের মধ্যে কোন রকম বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ বা বিজ্ঞানের সংগে তাঁদের পরিচয় হয় না। জনজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে বিষয়বস্তু নির্বাচিত হলে সেগুলি তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করতে অনেক সহজেই পারবে। তবে শহর ও গ্রামের সমস্যা এক নয়। তাই বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে জায়গা বিশেষে মডেল, চার্ট, বক্তৃতার বিষয়বস্তু ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক হওয়া দরকার। উচ্চতর বিজ্ঞানের দিকে চেয়েও কিছু কিছু মডেল প্রদর্শন এবং বক্তৃতা প্রদান হওয়া বাঞ্ছনীয়; তাতে বৈচিত্র্য থাকবে। জনমানসে বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে আরও প্রয়োজন জেলাভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নিয়মিত আলোচনা, নিয়মিত 'হাতে-কলমে' কেন্দ্র এবং বিজ্ঞান সংগ্রহশালা পরিচালনা, নিয়মিত বিজ্ঞান শিক্ষণ, সহজ ও সরলভাবে স্লাইড সহযোগে আঞ্চলিক ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা। এর ফলে বিজ্ঞান প্রচারে প্রাসঙ্গিকতা আসবে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই সমস্ত দিকে নজর রেখে কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

সমাজ ও দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব একমাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা, বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ কৌশলের সংগে নিরক্ষর ও সাক্ষর জনসাধারণের পরিচয় ঘটানোর মধ্য দিয়ে। উপরিউক্ত বিভিন্ন পদ্ধতি যতই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, জনমানসে বিজ্ঞান প্রচার ততই হবে সম্প্রসারিত এবং সার্থক।

শ্যামসুন্দর দে

For all Electrical, Electronic Components and Equipments and
any other odd items

Please contact :

D. S. ENTERPRISES

52/9C, B. B. Ganguly Street (1st floor),

Calcutta-700 012

(We also Supply Hydrogen, Nitrogen, Oxygen & other cylinders of various capacities ; Silica & Quartz tubes of different sizes)

ভারতবর্ষে ঔষধ শিল্পের গবেষণা—বর্তমান সমাজে প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা

[An attempt has here been made to trace the history of development of the Pharmaceutical Industry in India. The article also highlights the importance and potentialities of this industry in our country. Some measures have also been suggested to tackle the various problems in this sphere. The need to conduct serious researches in connection with the proper development of this industry has been stressed.]

গত শতাব্দীর শেষভাগে যখন বিদেশী শাসনের দরুন জাতীয় শিল্প বিকাশের অবকাশ খুবই সীমিত তখন ওষুধ শিল্পে ভারতের প্রথম পদার্পণ ঘটে। ১৯০১ সালে দূরদর্শী বৈজ্ঞানিক আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের চেষ্টায় আধুনিক ভারতীয় ওষুধ শিল্পে অগ্রদূত বেঙ্গল কেমিকাল এণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির মিলন ঘটানোর প্রয়াসে এই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক কাজ হ'ল আয়ুর্বেদে সুপরিচিত বনৌষধির আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবহার। প্রায় একই সাথে ১৯০৩ সালে প্রফেসর টি, কে, গজ্জারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এলেম্বিক কেমিক্যাল এবং এই প্রতিষ্ঠান স্পিরিট, টিঞ্চার ও গ্যালেনিকাল প্রস্তুতি শুরু করে। পরবর্তীকালে শ্রীযুক্ত রাজমিত্র ভাইলাল ডি আমীনের পরিচালনায় কোম্পানী ক্রমেই প্রসার লাভ করে এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে দেশীয় কারিগরি দ্বারা নির্মিত ও দেশীয় কলাকৌশল দ্বারা বিকশিত হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠান পেনিসিলিন এন্টিবায়োটিকের বৃহৎ প্রস্তুতকারকদের অন্যতম হয়ে ওঠে। ১৯১৯ সালে স্যর নীলরতন সরকার, স্যর কৈলাস চন্দ্র বোস ও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রমুখ চিকিৎসাবিদেরা বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ প্রতিষ্ঠা করায় প্রতিষেধক ও বায়োলজিকাল ওষুধ নির্মানে একটি প্রচেষ্টার দ্বার খুলে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক চিকিৎসাবিদকেই মুমূর্ষু রোগীর সামনে ইন্‌জেকশন ও ওষুধের অভাবে অসহায় দর্শকের মতই দাঁড়িয়ে থাকতে হত। এই অসহনীয় অবস্থা স্যর নীলরতন ও তাঁর সহকর্মীদের এদেশে সর্বপ্রথম এন্টিটক্সিক সিরাম উৎপাদনের অনুপ্রেরণা যোগায় এবং এরই ফলে বেঙ্গল ইমিউনিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের সুযোগ্য পরিচালনায় সম্পূর্ণ এদেশী কারিগরি ও কলাকৌশল এবং সম্পদ ব্যবহার করে এই ছোট্ট সংগঠনটি ধীরে ধীরে ভারতের সর্ববৃহৎ সিরাম ও টিকা তৈরির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, যখন সাধারণ ধারনা ছিল যে ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই ধরণের ওষুধ তৈরি করা যায় না।

পূর্বোক্ত পথিকৃৎদের প্রচেষ্টার অনুসরণে স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিকালস্, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিকাল, স্ট্যাডমেড, এলবার্ট ডেভিড ইত্যাদি আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কোনটি সম্পূর্ণ স্বদেশী মূলধনে আবার কোন কোনটি বিদেশী সহযোগিতায় গড়ে ওঠে এবং আধুনিক ভারতীয় ফার্মাসিউটিকাল শিল্প বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রাক্ স্বাধীনতাকালে ড্রাগস ও ফার্মাসিউটিকাল শিল্পের গবেষণায় সীমিত সুযোগ ও স্বল্প বিনিয়োগের ফলে গবেষণার কাজকর্ম প্রভূত বাধার সম্মুখীন হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে গবেষণার অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যবহৃত ওষধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। জটিল গবেষণাপদ্ধতির দ্বারা পরবর্তী স্তরে প্রতিষেধক দ্রব্যাদির সার্থক প্রস্তুতি সম্ভব হয়েছিল। এই পর্য্যায়ে স্যর ইউ, এন, ব্রহ্মচারী এদেশে কেমোথেরাপিউটিক গবেষণার সূত্রপাত করেন এবং ১৯২২ সালে কালাজ্বরেরক প্রতিষেধ ইউরিয়া স্টিবামিন আবিস্কার করে ভারতীয় কেমোথেরাপীর ইতিহাসে একটি অধ্যায়ের সূচনা করেন। ডঃ ব্রহ্মচারীর এই গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ১৯৩২ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ডোমাকের ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রোনটিসিলের আবিষ্কার ভারতীয় ফার্মাসিউটিকাল শিল্পে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে কেমোথেরাপিউটিক প্রতিষেধকের গবেষণায় নিযুক্ত হ'তে অনুপ্রেরণা যোগায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন কুইনাইন ও এটেব্রিনের মত ম্যালেরিয়া প্রতিষেধকের সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হ'ল তখন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে এলেন। ১৯৪১ সালে বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ-এ গবেষণারত ডঃ ইউ, পি, বসু ও তাঁর সহকর্মীরা একেবারে গোড়া থেকে এটেব্রিনের সংশ্লেষণ পদ্ধতি সার্থকভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এলেক্রিন এই ট্রেড নামে পদার্থটি বেঙ্গল ইমিউনিটি বিক্রির জন্য বাজারে ছাড়ে। এশীয় যুদ্ধের সময় পূর্বাঞ্চলে বিধ্বংসী ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে এই প্রতিষেধক দ্রব্যটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গত সাত দশকে ভারতীয় ড্রাগস ও ফার্মাসিউটিকাল শিল্পে গবেষণার

কাজকর্ম নিম্নলিখিত স্তরগুলির মধ্য দিয়ে গেছে; (ক) গ্যালেনিকাল দ্রব্যাদির প্রস্তুতি, (খ) বায়োলজিকাল দ্রব্যাদির প্রস্তুতি, (গ) কেমো-থেরাপিউটিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতি, ও (ঘ) এন্টিবায়োটিক প্রস্তুতি।

গ্যালেনিকাল প্রস্তুতির- গবেষণায় কর্নেল আর, এন, চোপরা, ডঃ কার্তিক চন্দ্র বোস, শ্রীএস, এন,বল প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অবদান অত্যন্ত মূল্যবান। অন্যান্য প্রচেষ্টার মধ্যে ভারতীয় ডায়োস্কোরিয়ার ওপর অধ্যাপক আর, এন, চক্রবর্তীর ব্যাপক গবেষণা ভারতবর্ষে নিজস্ব কলা-কৌশলের দ্বারা স্টেরয়েড শিল্প সার্থকভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। একই সাথে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা রাভোলপিয়া (সার্পেনটিনা স্পেসিস বাদে) থেকে রেজারপিন পৃথকীকরণ এবং চায়ের অবশেষে থেকে ক্যাফিন তৈরি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সরকার কর্তৃক গাজিয়াবাদে আফিং ফ্যাক্টরী এবং মাদ্রাজে ও পশ্চিম বাংলায় কুইনাইন ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা ফার্মাসিউটিকাল শিল্পের বিকাশে, বিশেষ করে ফাইটোকেমিকাল শাখায়, সাহায্য করছে। লেমন গ্রাস অয়েল থেকে বিটা আয়োনোন তৈরির পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতবর্ষে ভিটামিন-এ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

প্রচুর পরিমাণে এন্টিটক্সিন ও টকসয়েডের উৎপাদন বায়োলজিকাল ওষুধ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে দেশকে স্বনির্ভর করে তোলে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে কলাকৌশল বিকাশ সম্ভব করেছে। টি, সি, এফ এবং অন্যান্য ভারতীয় ওষুধ শিল্পে গবেষণার ফলে লিভার একস্ট্রাকট জাতীয় বিভিন্ন ওষুধ সদৃশ বিদেশী ওষুধগুলির জায়গা দখল করতে সক্ষম হয়েছে।

বিভিন্ন ওষুধ কারখানায় কেমোথেরাপীতে গবেষণা চলতে থাকে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে খাঁটি ভারতীয় সংস্থাগুলি প্রাথমিক স্তর থেকে অতি প্রয়োজনীয় যে সমস্ত ওষুধ তৈরির পদ্ধতি ও কলাকৌশল বিকশিত করেছে সেগুলি হল: (ক) বেঙ্গল ইমিউনিটির ক্লোরোকুইন (ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক), (খ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিকালসের আয়োডো ক্লোরোকুসো কুইনোলিন (আমাশয় প্রতিষেধক), (গ) সি, আই, পি, এল, বেঙ্গল ইমিউনিটি, সারাভাই—এর আইসোনিএজাইড (যক্ষ্মা প্রতিষেধক), ঘ) বেঙ্গল ইমিউনিটির ফেনফর্মিন (ডায়াবেটিক প্রতিষেধক) এবং (ঙ) বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্লোরপ্রপামাইড (ডায়াবেটিক প্রতিষেধক) ও ড্যপসন (কুষ্ঠ প্রতিষেধক)। কারিগরি এবং অত্যাধুনিক রাসায়নিক প্রয়োগবিদ্যা ও সন্ধানক্রিয়া (fermentation) এন্টিবায়োটিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। যুদ্ধোত্তর ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই শিল্পসমূহ কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এলেম্বিক ও স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিকালসের এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। নতুন এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থান এন্টিবায়োটিক লিঃ-এর উল্লেখযোগ্য অবদান হ'ল (১) এন্টি-ফাঙ্গাল এন্টিবায়োটিক, হ্যমিসিন (২) এনথেলমেটিক এন্টিবায়োটিক, এন্টিএমিবিন, (৩) উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণকারী অরোফাঙ্গিন।

ব্যাপক শিল্পায়ণের একটি অংশ হিসেবে ভারতবর্ষে ফার্মাসিউটিকাল শিল্প স্বাধীনতার পর অনেক বেশি সংগঠিত হয়েছে। ড্রাগস ও ফার্মা-সিউটিকাল শিল্প বর্তমানে দেশের প্রধান শিল্পগুলির অন্যতম বলে পরিগণিত। স্বাধীনতার ঠিক পরে ১৯৪৮ সালে ১০ কোটি টাকা থেকে ১৯৭৪-৭৫ সালে ৪০০ কোটি টাকা বিক্রির অঙ্কের পরিমাণ এই শিল্পের দ্রুত বিকাশের পরিচায়ক। মূলধন বিনিয়োগ ১৯৫২ সালে ২৪ কোটি টাকা থেকে ১৯৭১-৭২ সালে ২২৫ কোটি টাকা হয়েছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় বিনিয়োগের আনুমানিক লক্ষ্য হ'ল ৪৭৫ কোটি টাকা। বর্তমানে ২৩৪৩টি ফার্মাসিউটিকাল কারখানায় ওষুধ তৈরি হচ্ছে। রাজ্য অনুযায়ী ফার্মাসিউটিকাল কারখানার সংখ্যা যথাক্রমে অন্ধ্র (১২১) আসাম (২৩), বিহার (৫২), দিল্লী (৭৫), গোয়া (৩), গুজরাট (১৪২), হরিয়ানা (৫৪), হিমাচল প্রদেশ (৩), জম্মু ও কাশ্মীর (৬), কর্ণাটক (৬০), কেরালা (৫৯), মধ্যপ্রদেশ (১০৪) মহারাষ্ট্র (৮৭৮) [এর মধ্যে ৪১৫টি লোন লাইসেন্স ম্যানুফেকচার], উড়িষ্যা (৩৪), পণ্ডিচেরী (২), পাঞ্জাব (৩৮), রাজস্থান (৪৫), তামিলনাড়ু (১৮৭), ত্রিপুরা (৫), উত্তর প্রদেশ (১৮৮), পশ্চিমবাংলা (২৫২)। সব থেকে সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ১১৪টি সংস্থা কারিগরি উন্নয়ন অধিকর্তার তালিকাভুক্ত এবং এই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি মোট ওষুধের শতকরা ৮০ ভাগ উৎপাদন করে থাকে। এই সব সংস্থায় শতকরা ৫০ ভাগ বা তার কম বিদেশী মূলধন আছে।

ড্রাগস ও ফার্মাসিউটিকাল শিল্পে নিম্নলিখিত বহুমুখী ক্ষেত্রগুলিতে গবেষণা হয়ে থাকে—

(১) নতুন নতুন ওষুধের অনুসন্ধান এবং প্রচলিত ওষুধগুলির নতুন ব্যবহার সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা;

(২) গবেষণাগারে আবিষ্কৃত ওষুধে বাণিজ্যিক প্রস্তুতি ও বহুল পরিমাণে উৎপাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ফলিত গবেষণা;

(৩) যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট ধরনের ওষুধ তৈরির জন্য নিয়মিত গবেষণা;

(৪) ওষুধ প্রস্তুতির প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, পুনঃপ্রাপ্তি পদ্ধতির উন্নয়ন, সস্তায় ওষুধ পাওয়ার জন্য উন্নত ধরনের প্রক্রিয়া গড়ে তোলা এবং বিশ্লেষণের নতুন পদ্ধতির অনুসন্ধান; এবং

(৫) আমদানীকৃত ওষুধের মধ্যবর্তী দ্রব্যের (intermediate product) দেশীয় বিকল্প প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবনের জন্য এবং তৎসংক্রান্ত কাঁচা মালের অনুসন্ধানের জন্য গবেষণা।

এক একটি নতুন ওষুধের জন্য মৌলিক গবেষণা প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ, সময়সাপেক্ষ এবং বিভিন্ন শাখায় যেমন জৈব রসায়ন, ভৌত রসায়ন, এনালিটিকাল কেমিষ্ট্রি, ফার্মাকোলজি, টক্সিকোলজি, ইমিউনোলজি,

এমব্রায়োলজি, এণ্ডোক্রিনোলজি, পদার্থবিদ্যা, কেমিকাল ইঞ্জিনীয়ারীং, এবং আরও অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি-বিদের প্রয়োজন। এছাড়াও এক একটি নতুন ওষুধের জন্য গড়ে ৫০০০টি নতুন যৌগের বাছাই প্রয়োজন হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক একটি নতুন ওষুধ তৈরির খরচ হয় অনুমানিক ৩ থেকে ৭ মিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক ফার্মাসিউটিকাল শিল্পে এগিয়ে থাকা অংশের যেখানে গড়ে বাৎসরিক আয় ২৫০ কোটি টাকা সেখানে ভারতীয় ফার্মাসিউটিকাল শিল্পে খুব কম সংস্থারই আয় ১০ কোটি টাকার থেকে বেশি। সেইজন্য ভারতবর্ষে কয়েকটি সরকারী সংস্থা ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া এই ধরনের গবেষণার কাজকর্ম হাতে নেওয়ার সামর্থ্য অধিকাংশ সংস্থারই নেই। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে যে চেষ্টা হয়েছে তা প্রশংসার দাবী রাখে। স্বাধীনতার ঠিক পরেই কলকাতায় ১৯৪০ সালে বেঙ্গল ইমিউনিটি রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ইনষ্টিটিউট অন্তত তিনটে নতুন ওষুধ আবিষ্কার করে যেমন, সালফাবেঞ্জাইড (এন্টি-ব্যাকটেরিয়াল), সুপাজিন (এন্টিম্যালেরিয়া), পাইরাপেন (এন্টিস্প্যাজ-মোডিক)। ইদানীং আরও কয়েকটি গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—হিন্দুস্থান এন্টিবায়োটিকস লিঃ (১৯৫৫), সিবা রিসার্চ সেন্টার (১৯৬৩) (বর্তমান নাম সিবা-গাইগি রিসার্চ সেন্টার), সারাভাই রিসার্চ সেন্টার (১৯৬৭), হেক্সট রিসার্চ সেন্টার (১৯৭৩)। এ ছাড়াও এলেম্বিক কেমিকাল, বেঙ্গল কেমিকাল ও ফার্মাসিউটিকাল, বোয়িঙ্গার-হল, সি, আই পি এল এ, কেমোফার্মা, সায়নামাইড, দেজ মেডিকাল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিকাল, জনসন এণ্ড জনসন. আই ডি পি এল, গ্লাক্সো-বি ডি এইচ, মে এণ্ড বেকার, ফাইজার, র‍্যপ্টাকস ব্রেট, রিচার্ডসন হিন্দুস্থান স্যাণ্ডোজ, স্মিথ-ক্লাইন এণ্ড ফ্রেঞ্চ, ইউনিকেম, ওয়ার্নার-হিন্দুস্থান এবং আরও কয়েকটি সংস্থার নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কেন্দ্র আছে।

১৯৭১ সালে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় ভারতীয় ওষুধ শিল্পের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক খাতে মোট ব্যয় ছিল ৫ কোটি টাকার মত যা মোট বাৎসরিক আয় ২২৫ কোটি টাকার শতকরা ২ ভাগ। পাশ্চাত্যের ফার্মাসিউটিকাল শিল্পে গবেষণাখাতে মোট খরচ করা হয় বাৎসরিক আয়ের শতকরা দশ থেকে বারো ভাগ। তা সত্ত্বেও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এদেশের ফার্মাসিউটিকাল গবেষণার ক্ষেত্রে মৌলিক অনুসন্ধানে অগ্রগতির সূচনা। ড্রাগস ও ফার্মাসিউটিকাল গবেষণায় ভারতবর্ষ একটি সুদৃঢ় ভিত্তি অর্জন করেছে এবং গবেষণা ও উন্নয়নে যথোপযুক্ত পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি দিলে জাতির কল্যাণ সাধন করতে পারে।

যদি ভারতবর্ষের মত একটি বিশাল উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ কার্য্যকরী করতে হয় তা হলে সম্পদ ও শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নির্দিষ্ট জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীর দিকে পরিচালিত করতে হবে। এই প্রসঙ্গে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হল মড়ক নিবারণ, ছোঁয়াচে রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং হাসপাতালের সুযোগ সুবিধা বিস্তৃত করে মৃত্যু হার কমানো ও শিশু মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া। ওষুধ তৈরির মূল উদ্দেশ্য মানবজাতির কল্যাণ সাধন। এই জন্য ফার্মাসিউটি-কাল শিল্পে যত শীঘ্র সম্ভব স্বনির্ভরতা অর্জন করার চেষ্টা চালানো প্রয়োজন এবং আমদানীকৃত ওষুধের বিকল্প পদার্থের গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। ১৯৭১-৭২ সালে আমদানীর মূল্যমান হ'ল ২৪৫ মিলিয়ন টাকা (সি, আই, এফ মূল্য) যার মধ্যে এন্টিবায়োটিক (৯৫ মিলিয়ন টাকা), সালফা (২৭·৫ মিলিয়ন টাকা), ভিটামিন (২০ মিলিয়ন টাকা), এনালজেসিক এবং এন্টিপাইরেটিক (১০ মিলিয়ন টাকা), বাদবাকী ৭০ মিলিয়ন টাকা দিয়ে আমদানী করা হয় অনার্দ্র ডেক্সট্রোজ, ক্যাফিন, এফিড্রিন, এরগোট এলকালয়েড, ইনসুলিন, মিথাইল ডোপা, নাইট্রো-ফিউরান, ইত্যাদি। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই ওষুধগুলিতে স্বনির্ভর হতে হলে আরও প্রণালীবদ্ধ ও নিবিড় গবেষণা প্রয়োজন হয়ে পড়বে। এই প্রসঙ্গে জাতীয় স্তরে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সময়সীমা নির্দিষ্ট করে একটি পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং এই প্রকল্প বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার গবেষণা প্রতিষ্ঠান অথবা জাতীয় গবেষণাগারের সাহায্যে হতে পারে। এই সব গবেষণাকেন্দ্র আমদানীকৃত দ্রব্যের বিকল্প প্রস্তুতিতে যথেষ্ট কারিগরি দক্ষতা অর্জন করেছে।

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গবেষণাকেন্দ্রগুলির সম্ভাবনা বিচার করে যে প্রতিষ্ঠানগুহি বিভিন্ন বিষয়ে ওষুধ গবেষণার মূল ক্ষেত্র হতে পারে তা হ'ল—

(ক) এন্টিবায়োটিক ও এনজাইমের ক্ষেত্রে এলেম্বিক কেমিকাল রিসার্চ সেন্টার (এ, আর, সি), সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (সি, ডি, আর, আই), হিন্দুস্থান এন্টিবায়োটিকস লিঃ (এইচ এ এল); ইণ্ডিয়ান ড্রাগস ও ফার্মাসিউটিকাল লিঃ (আই ডি পি এল হৃষিকেশ), সারাভাই রিসার্চ সেন্টার (এস আর সি), পার্ক ডেভিস, ইউনিকেম লেবরেটরী।

(খ) সালফাজনিত ওষুধে অতুল প্রোডাক্টস, সি ডি আর আই, সিবা-গাইগী, আই ডি পি এল (হায়দ্রাবাদ), এন সি এল, আর আর এল (হায়দ্রাবাদ)।

(গ) ভিটামিনে আই ডি পি এল, গ্লাক্সো-বি ডি এইচ, মার্কশার্প এণ্ড ডোহম (এম এস ডি), এন সি এল, রোস।

(ঘ) হরমোন সংক্রান্ত ওষুধে সি ডি আর আই, সিবা-গাইগী, সি আই পি এল এ, গ্লাক্সো-বি ডি এইচ, অর্গানোজ, এস আর সি।

(ঙ) ম্যালেরিয়া প্রতিষেধকে বি আই আর আই, আই ডি পি এল, পার্ক ডেভিস, বেয়ার, রানব্যাক্সি, সুনীতা লেবরেটরী।

(চ) এনালজেসিক ও এন্টিপাইরেটিক জাতীয় ওষুধে সি ডি আর আই, হেক্সট, আই ডি পি এল, স্যাণ্ডোজ, ইউনিকেম লেবরেটরী।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের ক্ষেত্রে অন্যান্য সংস্থার গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। গোটা পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করা ও নির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য হাতি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সি এস আই আর লেবরেটরীর, সরকারী ও বেসরকারী গবেষণা কেন্দ্রের, পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন মন্ত্রকের, বিজ্ঞান ও কারিগরি মন্ত্রকের, বিশ্ববিদ্যালয় ও আই আই টির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় ঔষধ কর্তৃপক্ষ (National Drug Anthorities) গঠন করা প্রয়োজন। প্রতিটি গবেষণার ক্ষেত্রে (ব্যাপকতর) অর্থে ৫-৭ জন বিশেষজ্ঞের একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন যার আহ্বায়ক জাতীয় ঔষধ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের কর্মসূচী পেশ করবেন এবং জাতীয় ঔষধ কর্তৃপক্ষ সরকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে কমিটিগুলিকে এই কর্মসূচী রূপায়ণের পূর্ণ দায়িত্ব দেবে। আমদানীকৃত দ্রব্যের বিকল্প প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, বিশেষ যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও সংশ্লেষক যন্ত্রের চাহিদা সময়ের অপচয় না ঘটিয়ে সরকারী সহযোগিতায় পাওয়া উচিত। সময়-সীমা নির্দিষ্ট কর্মসূচী নেওয়া উচিত এবং কাজের অগ্রগতি নির্দিষ্ট সময় অন্তর জানানো উচিত। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার দরুন এদেশে গবেষণার সুযোগ এখন সম্প্রসারিত, তাছাড়া অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক বিজ্ঞানকর্মীর উপস্থিতি ও প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ নিশ্চিতভাবে ভারতের অবস্থাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেছে। এখন প্রয়োজন হ'ল ভারতীয় বিজ্ঞানী ও কারিগরি-বিদদের সৃজনশীল প্রতিভাকে যথোপযুক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে বিকশিত করা যার ফলে দেশের সার্বিক অর্থ নৈতিক উন্নতি ঘটতে পারে।

আশানুরূপ ফল পেতে হলে ভারতীয় ওষুধ শিল্পের গবেষণা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে সব বাধার সম্মুখীন হচ্ছে তা দূর করা প্রয়োজন। বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সাথে যুক্ত শিক্ষার মান পর্যালোচনা করতে হবে এবং বর্তমান প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে, আই আই টিতে ও ফার্মাসী কলেজগুলিতে এমন পাঠ্যসূচী নির্ধারিত করতে হবে যাতে যে সমস্ত ছাত্ররা এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসছেন তাঁরা যেন বর্তমান পরিস্থিতিতে ওষুধ শিল্পের অগ্রগতি ও বিকাশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন।

ফার্মাসিউটিকাল শিল্প প্রধানত ছোট ও বড় রাসায়নিক শিল্পগুলির ওপর নির্ভরশীল। স্বাধীনতার সময় যদিও এই ধরনের শিল্পের অস্তিত্বই ছিল না, পরে জৈব, অজৈব ও পেট্রোকেমিকাল শিল্পের সংখ্যাবৃদ্ধি পেলেও তা পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রসারলাভ করতে পারে নি। ফার্মাসিউটিকাল শিল্পে এখনও প্রচুর পরিমাণে মধ্যবর্তী উপাদান আমদানী করতে হয় যা এই শিল্পের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গবেষণা ও উন্নয়নের ফলাফলকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হল উৎপাদন প্ল্যান্টগুলোর ছোট আয়তন, কাঁচা মালের ঘাটতি, জ্বালানী ও বিদ্যুত সংকটের জন্য প্ল্যান্টের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে না পারা, আমদানী রপ্তানী নিয়মের ঘন ঘন পরিবর্তন, লাইসেন্স প্রথা, সরকারের ঋণ ও মুল্যমান প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক নীতি।

মূল্যমানের দিক থেকে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। ম্যালেরিয়া নিবারণের ওষুধ ক্লোরোকুইন উৎপাদনের সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করে। যে সতেরোটি কাঁচা মাল ওষুধটি তৈরি করার জন্যে প্রয়োজন তার মধ্যে দুটি কাঁচা মাল, নোভোল ডায়ামিন ও ডাইইথাইল-ইথক্সি মিথিলিন ষেলনেট এখনও বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। আই ডি পি এল এবং র‍্যানব্যক্সি এই দুটি পদার্থের গবেষণায় প্রাথমিক স্তরে আছে। অদূর ভবিষ্যতে এই দুটি কাঁচামাল দেশে তৈরি করা গেলেও দেখা যাবে ক্লোরোকুইনের দাম অনেক বেশি পড়ছে। এর কারণ এই নয় যে ভারতীয় কারিগরি বিদেশী কারিগরির তুলনায় নিকৃষ্ট, আসল কারণ হল, এই কাঁচামাল উৎপাদনে দাম অনেক বেশি পড়ে। ভারতীয় কোম্পানীগুলি এই কারণে ক্লোরোকুইন আমদানী এগিয়ে আসছে না। তাই ক্লোরোকুইন প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করতে হচ্ছে।

৮-হাইড্রক্সিকুইনলিনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। দুর্গাপুর কেমিক্যালস, হার্ডিলিয়া ও হিন্দুস্তান অরগানিক কেমিক্যাল-এর জন্য প্রয়োজনীয় মূল কাঁচা মাল কেবল সরবরাহ করতে পারে ও এই উৎপাদনের কলাকৌশল ভারতের গবেষণা কেন্দ্র-গুলিতেই উদ্ভাবন করা হয়েছে, কিন্তু প্রস্তুতির জন্য অন্যতম উপাদান গ্লিসারিনের অত্যধিক দামের ফলে ৮-হাইড্রক্সিকুইনলিনের দামও অনেক বেশি পড়ে। আমাশয় প্রতিষেধক ওষুধ প্রস্তুতির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় এটিকে প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে জাতীয় নীতি হিসেবে সরকারের কি উচিত এই সব ওষুধ শিল্পের মধ্যবর্তী উপাদান আমদানী করা যদি দেশে তার বিকল্প থেকে থাকে? আমদানীকৃত দ্রব্যের বিকল্প প্রস্তুত করার গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে ব্রতী হওয়ায় আগে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

যদি স্বদেশী ওষুধের দাম বেশি হয় তা হলেও সরকারকে ভরতুকি দিতে হবে যেমন রপ্তানী বাড়ানোর জন্য দেওয়া হয়। ওষুধ শিল্পে ভারতীয় কলাকৌশল প্রতিষ্ঠিত হ'লে মজুর থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীও কারিগরিবিদদের চাকুরি হওয়ার সম্ভাবনা ও সুযোগ বাড়বে আর বিদেশী প্রভুত্বের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং অসংখ্য জনসাধারণের সুস্থ জীবনের বিকাশ ও প্রতিপালনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সত্যিকারের স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা যাবে।

কারিগরি ও উন্নয়নে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য ওষুধ ও মধ্যবর্তী

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিজ্ঞানকর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসঙ্গে

এ কথা আপনারা অনেকেই জানেন যে প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চার জন্য যে আবহাওয়ার প্রয়োজন তা অনুপস্থিত; এমনকি স্বশাসিত অথচ বিধিবদ্ধ নয় এরকম বিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার ত' নেইই উপরন্তু চাকুরির নিরাপত্তাও নেই। যে কোনো সময়ে কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশীর ফলে একজন বিজ্ঞানকর্মীর চাকুরি চলে যেতে পারে এবং এর বিরুদ্ধে কর্মচ্যুত ব্যক্তি আদালতের আশ্রয় পর্য্যন্ত পেতে পারেন না কারণ তাঁরা নাকি সংবিধানের ২২৬ ধারার আওতায় পড়েন না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এর বলি হয়েছেন এবং হচ্ছেন। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন—কোথাও আংশিকভাবে সার্থক হয়েছেন কোথাও বা ব্যর্থ হয়েছেন। এই আন্দোলনগুলি থেকে একটি শিক্ষা বিজ্ঞান কর্মীরা গ্রহণ করেছেন যে বিচ্ছিন্নভাবে সংগঠিত একটি আন্দোলনের ফলে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সাফল্য অর্জন করা যাবে না। গত ৮ই মার্চ, ১৯৭৮ বিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই অমর্য্যাদাকর প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের অবসানকল্পে ও প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান কর্মীদের একটি সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় যাহা ইনষ্টিটিউট, সেন্ট্রালগ্লাস এণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট, কলেরা রিসার্চ সেণ্টার, ক্যান্সার রিসার্চ সেণ্টার, IIEM, JARI এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দেড়শতাধিক বিজ্ঞান কর্মীর উপস্থিতিতে সভার কাজ চলে। সভায় বিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ অবৈজ্ঞানিক ও অগণতান্ত্রিক রীতি-নীতির নজির বক্তারা তুলে ধরেন। সভা থেকে এই প্রস্তাব গহণ করা হয় যে আগামী ছ মাসের মধ্যে বিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের একটি সম্মেলন আয়োজন করা হবে এবং এই সম্মেলনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, সমিতির এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হবে।

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রশ্নটি বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যে নিপীড়নমূলক আবহাওয়ার মধ্যে বিজ্ঞানকর্মীদের কাজ করতে হয় তা নিতান্তই মধ্যযুগীয় সামন্ত শাসনের সাথে তুলনীয়। বিজ্ঞানকর্মীরা যে প্রতিষ্ঠানেই থাকুন না কেন ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। কেবলমাত্র এই দাবী আদায়ের জন্যই নয় প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চার একটী আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যও বিজ্ঞানকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে এই সংগ্রামে সামিল হওয়া প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে ব্যাঙ্গালোর ওয়াটার সাপ্লাই এণ্ড সুয়েজ বোর্ড বনাম এ রাজাপ্পা ও অন্যান্যদের কেসে বিচারপতি নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে এই রায় দেন যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্প হিসেবে মেনে নেওয়া হোক এবং এই বিরোধগুলিকে শিল্প বিরোধ আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। পূর্বতন সি, এস, আই, আরের নিয়োগকর্তা—কর্মীদের কেসে নিয়োগকর্তা—কর্মীদের সম্পর্ককে "প্রভু ভৃত্য" সম্পর্ক হিসেবে ধরা হয় এবং জানানো হয় যে সংবিধানের ২২৬ ধারার সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করতে পারবেন না। প্রকৃতপক্ষে, রাজাপ্পা কেসের রায় তাকে নাকচ করে দিল।

নিঃসন্দেহে এই সমস্ত রায় বিজ্ঞান কর্মীদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করবে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে বিজ্ঞানকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলনই এই সমস্ত রায় বা আইনকে টিকিয়ে রাখার ও কার্যকরী করার একমাত্র গ্যারান্টি। গণতন্ত্রের জন্য, বিজ্ঞানের স্বার্থে ও বিজ্ঞানকর্মীদের সপক্ষে এই সমস্ত অমানবিক অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী রীতি নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ান। আগামী সম্মেলন সফল করার জন্য নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুতি চালান।

ভারতবর্ষে ঔষধ শিল্পের গবেষণা

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

উপাদানের বিকল্প প্রস্তুতের গবেষণায় অগ্রাধিকার দিতে হবে। বনৌষধির বৈজ্ঞানিক চাষের দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ফাইটোকেমিকাল শাখার বিকাশ ঘটাতে হবে। বায়োলজিকাল ও গ্ল্যাণ্ডুলার দ্রব্যাদি প্রস্তুতির জন্যে পশু সম্পদেরও প্রকৃত ব্যবহার হওয়া লচিত।

ভারতবর্ষে ফার্মাসিউটিকাল শিল্পের সম্ভাবনা প্রচুর। প্রকৃত সাহায্য, উৎসাহ ও পরিচালনা পেলে এই শিল্প সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে এবং কোটি কোটি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রস্তুতির প্রয়াস সার্থক করে তুলতে পারবে।

এম এস চক্রবর্তী
বেঙ্গল ইমিউনিটি রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

বিজ্ঞান, সিয়া ও ষড়যন্ত্র

সাম্প্রতিক সংবাদ—হিমালয়ের নন্দাদেবী শৃঙ্গের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জুড়ে সিয়া (C I A)-র বারো বছর ব্যাপী একটানা ব্যাপক তৎপরতা। এবং জানা যাচ্ছে যে তা ঘটেছে ভারতের পরপর তিন প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে ও সম্মতিতে। খবরে প্রকাশ, চীনের পারমাণবিক অস্ত্র-সম্ভারের হিসাব-হদিশ করতেই নাকি ভারতসরকার ও সিয়ার এই যুক্তফ্রন্ট। প্রতিরক্ষার মহান (!) উদ্দেশ্যেও একটি বিদেশী গোপন সংস্থার কাছে স্বদেশীয় ভৌগলিক জ্যামিতি উন্মোচনের এমন ধিক্কারজনক নজির স্বাধীন দেশে খুব কমই চোখে পড়ে এবং তারপরেও 'জোট নিরপেক্ষতা', 'স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র' মার্কা লেবেল লাগিয়ে ঘোরার নির্লজ্জতার নিদর্শনও বোধ হয় বড় একটা দেখা যায়না।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে ১৯৬৬ সাল নাগাদ দুটি প্লুটোনিয়াম-শক্তি নিয়ন্ত্রিত আড়িপাতা যন্ত্র বসানোর উদ্দেশ্যে নন্দাদেবী শৃঙ্গে আরোহণের জন্য সি, আই, এ একটি দল পাঠায়। কিন্তু প্রচণ্ড তুষার-পাতের মুখে অভিযাত্রী দলটি লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং ইচ্ছে ক'রেই বা অবস্থার চাপে যন্ত্র দুটি তারা সেখানে ফেলে আসে। তারপর থেকে বারবার চেষ্টা করেও শয়তানরা আজ পর্যন্ত সে যন্ত্র দুটির কোন সন্ধান পায়নি। অনুমান করা হচ্ছে যে বড় বড় বরফচাঁই এর তলায় বা ধ্বসের মুখে সেই যন্ত্র দুটি গুঁড়িয়ে গিয়েছে—কিন্তু প্লুটোনিয়ামের তেজস্ক্রিয় চরিত্রের তাতে কোন হেরফের হয়না। যেহেতু ঘটনাস্থল থেকে গঙ্গার গতিপথের দূরত্ব বেশি নয় এবং প্লুটোনিয়ামের তেজস্ক্রিয় চরিত্র বজায় থাকে একশ বৎসরের কাছাকাছি, গোটা ঘটনায় প্রথম ও প্রধান কুফলের সম্ভাবনা হ'ল—গঙ্গার জল দূষিত হওয়া, যে গঙ্গা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভারতবাসীর প্রাণ বললে অত্যুক্তি হয় না। লক্ষ্যণীয় যে ভাবা এ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের দু'জন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী সংলগ্ন অঞ্চল ঘুরে এসে সাংবাদিকদের কাছে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। বোধ হয় 'কিছু হয়নি' বা কিছু হবেনা' এমন কথা বিজ্ঞানী হয়ে সত্য ও সততার খাতিরে তাঁরা বলতে পারছেন না। আবার সব সময় অকপটে সত্য ভাষণ নিরাপদ ও বাঁচার পথ নয়—হতে পারে তাই তাঁরা চুপ থাকতে চেয়েছেন। অথবা কোন সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করার আগে আরো ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদন্তের প্রয়োজন—সস্তা স্তোকবাক্যের পরিবর্তে আমরাও তাই চাই। ক্যানসার ও গ্যাসট্রো এন্ট্রাইটিস রোগীর সংখ্যা দিনে দিনে যেভাবে বাড়ছে তাতে গঙ্গার জল দূষিত হওয়ার ব্যাপারটা আমরা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারিনা। ঘটনাটির সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক দিকগুলো সম্পর্কে আমরা সুষ্ঠু তদন্তের দাবী করছি।

বিজ্ঞান কলেজে কনভেনশন ও আলোচনা চক্র

গত ১লা এপ্রিল ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (বিজ্ঞান কলেজ) এর উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে শিক্ষা আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করার প্রচেষ্টা হিসাবে এই কনভেনশন অনেকটা সফলতা দাবী করতে পারে। সভায় ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব আলোচিত হয়। এছাড়া বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের তরফ থেকে বহু বক্তা আজকের সামাজিক পরিস্থিতিতে শিক্ষার যথার্থ ভূমিকা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে বক্তব্য রাখেন। অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র শিক্ষাব্যবস্থার সুদূর প্রসারী উন্নতির পূর্বসর্ত হিসাবে সমাজের দরিদ্র অংশগুলির স্বার্থের স্বপক্ষে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বিজ্ঞান কলেজ ফলিত পদার্থবিভাগের বার্ষিক পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে ১২ই এপ্রিল 'ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা ও গবেষণার সমস্যা' শীর্ষক এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। এ ধরনের আলোচনাচক্র বিজ্ঞানকর্মীদেরকে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানের সঠিক সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় আন্দোলনে সংঘবদ্ধ হতে সহায়তা করবে।

উভয় সভাতেই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার পক্ষে বক্তব্য রাখেন রবীন মজুমদার।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সাধারণ সভা

গত ২৯শে এপ্রিল '৭৮, পঃ বঃ বিঃ কঃ সংস্থা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে সভ্যদের এক সাধারণ সভা আহ্বান করে। সভায় সাধারণ সম্পাদক সংস্থার বিগত এক বছরের রিপোর্ট পেশ করেন। সভায় বিভিন্ন কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিরা বিজ্ঞানকর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। "প্রভু-ভৃত্য" সম্পর্কের অবসান ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে বিজ্ঞানকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়। সভায় "প্লুটোনিয়াম স্পাইং" প্রসঙ্গে, পত্তনগরে গণহত্যার প্রতিবাদে, জি. এস. আই-তে থ্যালিয়াম গ্রহণজনিত দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে, এবং 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্কের অবসান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের গণতন্ত্রীকরণের দাবীতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

BHEL-এর খরচ জোগায় কে ?

মহাশয়,

মিঃ জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ দাবী করেছেন যে ভারত হেভি ইলেক্‌ট্রিক্যালস্ লিমিটেড (BHEL) "তার চমৎকার কাজের জন্য বিশ্বের স্বীকৃতি পাচ্ছে। লিবিয়া সরকার সম্প্রতি এক ফ্রেঞ্চ কোম্পানীর বদলে BHEL কে একটী প্রকল্প তৈরির দায়িত্বভার অর্পণ করেছে।"

মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে BHEL-এর তৈরি জিনিস (যার প্রধান ক্রেতা ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগ) দেশের বাজারে যে দামে বিক্রী হয় তা বিদেশী সমমানের জিনিসের দামের কমপক্ষে দ্বিগুণ। কিন্তু অর্ডার সংগ্রহের স্বার্থে সেই একই জিনিস BHEL বিদেশের বাজারে বিক্রী করে অন্যান্য প্রতিযোগী বিদেশী কোম্পানীর চেয়ে অনেক কম দামে। ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী বিদেশী দেশগুলি ভালোমতই জানে যে BHEL ব্রিটেন, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানী এবং অন্যান্য পশ্চিমী দেশ থেকে কারিগরী ক্রয় করেছে। সুতরাং যেহেতু ভারতে উৎপাদন-মূল্যের চেয়েও শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কম দামে জিনিসগুলো তারা পেয়ে যায় বিদেশী ক্রেতারা তাই BHEL কেই পছন্দ করে বেশি।

কিন্তু এই 'চমৎকার কাজ'-এর ধাক্কা সামলাতে হয় কাদের ? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করদাতা লক্ষ লক্ষ ভারতীয় জনগণ তেলবেনিয়া জাতিগুলোকে পুষ্ট করে যাচ্ছে BHEL মারফৎ, যে BHEL ডিসকাউণ্টে বিক্রীর মাধ্যমে 'চমৎকার কাজ' করে যাচ্ছে। ভারতীয় জনগণ এতদিন BHEL কে সাহায্য করে এসেছে — এখন BHEL-এর সে ঋণ শোধ করার পালা। একাজ তারা করতে পারে ষ্টেট ইলেক্‌ট্রিসিটী বোর্ড প্রভৃতি সরকারী সংস্থাগুলোকে বিদেশের সমান দামে নানা যন্ত্রপাতি বিক্রয় ক'রে। এতে ভারতীয়দের জন্য বিদ্যুৎ সস্তা হবে। এখন ভারতীয় করদাতাদের ঠকিয়ে BHEL অন্যান্য দেশকে সস্তা বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাহায্য করে যাচ্ছে।

জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ-এর BHEL সম্পর্কিত মন্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার যে জনতা সরকারের মূল্য ও আয় নীতি এখনও স্পষ্ট নয়। তার "গতিশীল শিল্পনীতি" কৃষিশ্রমজীবীদের বঞ্চিত করছে—যাদের আয় দিনে অনধিক পাঁচ টাকা। এবং তারাই মাথা ভারি BHEL ও তার উৎপন্ন পণ্যের বিদেশী খদ্দেরদের উদরপূর্তি করে যাচ্ছে। যদি কৃষি-শ্রমিকদের আরো বেশী উৎপন্ন করবার মত অনুকূল মানসিকতা তৈরি না করা যায় তবে BHEL এর চমৎকার কাজ হয় বন্যার জলে ভেসে যাবে না হয় খরায় শুকিয়ে যাবে। —

সুনীল পাল, লণ্ডন
১০ই এপ্রিল

[চিঠিটি ২২শে এপ্রিল, '৭৮ এর স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় অনুবাদ করে এখানে ছাপানো হ'ল—সম্পাদক]

With best compliments of

BISWAS CHEMICAL ENTERPRISE

10, CHOWRINGHEE ROAD,
CALCUTTA-700 013
Phone : 23-5178

●

Distributor of

MAY & BAKER

PHOTOGRAPHIC, PROCESS & X-RAY CHEMICALS

●

Stockist of

B. D. H., E. MERCK & PFIZER

LABORATORY REAGENTS & CHEMICALS

●

Selling Agent of

HOSPITAL & NURSING APPLIANCES AND ENAMELLED WARES OF

SUR ENAMEL

●

Dealer in all kinds of Laboratory Reagents & Chemicals, Scientific Glasswares, Scientific Instruments, Laboratory Apparatus and Appliances including Hospital Supplies.

চিঠিপত্র

সম্পাদক মহাশয়,
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী,
সমীপেষু

'বিজ্ঞানের ইতিহাসের ভূমিকা' প্রবন্ধে (জানুঃ-ফেব্রুঃ '৭৮) লেখক 'বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' এবং ডারউইনের তত্ত্ব ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছেন, সে সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্যের প্রয়োজন আছে।

কয়েকটি সাধারণ সূত্র থেকে বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে তথাকথিত "পরমসত্যে" উপনীত হওয়া অর্থাৎ deductive method গ্রীকযুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে এই "পরম সত্য"কে যাচাই করার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ছিল অনেকক্ষেত্রেই উপেক্ষিত। ফলে গ্রীকযুগের শেষপর্বে এবং পরবর্তী মধ্যযুগে বিজ্ঞান অতীন্দ্রিয়তাবাদের (mysticism) কুয়াশায় ঢাকা এক কানাগলিতে পড়েছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রধানতঃ রজার বেকনের প্রভাবে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে স্বীকৃতি পায়। এবং পরবর্তী যুগের বিজ্ঞান উপরোক্ত ভাববাদী (idealistic)—বিচ্যুতি মুক্ত হয়ে একটি বস্তুবাদী (materialistic) ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি নয় এবং "এই হোলো বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী" লেখকের এই উক্তিটিও বিভ্রান্তিকর।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ করার জন্য একটী বস্তুকে তার পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে অধ্যয়ন করা (study in isolation) প্রয়োজন কিন্তু এই জ্ঞানকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিলে নতুন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। এংগেল্‌স্ "Dialectics of Nature" গ্রন্থে বেকনপরবর্তী যুগের এই বিভ্রান্তির কথা আলোচনা করেছেন। শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহে নয়, একটি সঠিক দৃষ্টিভংগীর আলোকে আপাতঃ বিচ্ছিন্ন তথ্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক (interconnections) নিরূপণ এবং বস্তুজগতের পরিবর্তন ও বিকাশের অধ্যয়নের সাহায্যেই বিজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে। এই প্রসংগে Engels-এর একটি সাবধানবাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "Empirical Natural Science has accumulated such a tremendous mass of positive material for knowledge that the necessity of classifying it in each separate field of investigation systematically and in accordance with its inner interconnections has become absolutely imperative ..... In doing so, however natural science enters the field of theory and here the method of empiricism will not work, here only theoretical thinking can be of assistance"

এর পর আসা যাক্ লেখকের বক্তব্যের অন্য অংশে। উনি বলছেন, "ডারউইনের তত্ত্ব মানুষের চিন্তাধারাকে ব্যাপকভাবে পাল্টে সমাজতন্ত্রের আদর্শ আরও ইপ্সিত ও সহজলভ্য করে তোলে।" কিন্তু ডারউইনের তত্ত্বের প্রভাবে মানুষের চিন্তাধারা কি ব্যাপকভাবে শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রের দিকেই ঝুঁকেছিল? তা নিশ্চয়ই নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে "Survival of the fittest" তত্ত্বকে কেন্দ্র করে "Social Darwinism" মতবাদ প্রচারিত হয় যার প্রবক্তারা বলেছিলেন—ধনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত কারণ এই সমাজের শাসকরা হবেন সমাজের যোগ্যতম অংশ। Freda Salzman বলেছেন, "In the US Social Darwinism provided important support for the eugenics movement which led to sterilisation laws in a number of states and immigration law of 1924, which restricted immigration, on the basis of national origin." Social Darwinism এর বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশের বিরুদ্ধে অনেক বৈজ্ঞানিকই কলম ধরেছেন এবং J. B. S. Haldane এর 'Heredity and Politics' বইটি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান।

তাছাড়া লেখক যে "সমাজতন্ত্রের আদর্শের" কথা বলেছেন—সেটা কী? সমাজতন্ত্রেরও ত রকমফের আছে। আবার যে কোনো সমাজতন্ত্রেরই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আদর্শ আছে এবং সাধারণভাবে তার দার্শনিক মতাদর্শও আছে। Haldane বলেছেন "Marx and Engels criticised Darwin for taking contemporary

economic conditions as a model for competition in animal world"। ডারউইনের তত্ত্বে নিহিত Malthusian তত্ত্বের কথাই হালডেন এখানে উল্লেখ করেছেন। লেখক কি তাহলে সমাজ তন্ত্রের আদর্শ বলতে দার্শনিক মতাদর্শ বা ধরা যাক, Dialectical Materialismর কথা বলেছেন? মার্কস এংগেলসকে চিঠিতে লিখেছেন যে তিনি ডারউইনের তত্ত্বে "the basis in natural history for our view" খুঁজে পেয়েছেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে ডারউইনের তত্ত্বে Dialectical Materialism এর 'Practical proof' (Engels) পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রসংগে ডরউইন-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সীমাবদ্ধতা উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। Haldane এর কথায় "Darwin believed that it (evolution) took place not only as a result of natural selection, but from the inheritence of the effects of use and disuse. Darwin did not hold the latter view so strongly as Lamarck and Herbert Spencer, but Engels followed him in his partial Lamarckism. That view is almost completely unsupported by serious evidence". পরিশেষে এ কথা বলতে চাই —জীববিবর্তনবাদে এখনও উত্তেজনাপূর্ণ গবেষণা চলছে এবং অনেকেই মনে করেন, "Darwinism.....is really a thing of the past" (Haldane)

অমিতাভ দত্ত
সুনীল মুখার্জী

[নিচের চিঠিটি পন্থনগর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বিজ্ঞানকর্মী বন্ধু পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পাদককে পাঠিয়েছেন]

শ্রদ্ধেয় .....

গত ১৪ তারিখ থেকে প্রকাশিত পন্থনগর সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিশেষ করে গত ১৪ ও ১৫ তারিখের টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়ার সংবাদগুলির (পন্থনগর সংক্রান্ত) দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

গোবিন্দবল্লভ পন্থ কৃষি ও প্রায়োগিক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের গবেষণা-কর্মীদের মেধা ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য আজকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকমের ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যাবার পর বিজ্ঞান কর্মীরা চুপ করে থাকতে পারেন না।

এখানে শতকরা ৯০ ভাগ স্নাতকোত্তর ছাত্র "কৃষি গবেষণা সার্ভিসে" সাফল্য লাভ করেছে। সুতরাং বলা চলে আগামী দিনের সম্ভাবনাময় বৈজ্ঞানিকরা আজ এখানে ছাত্র। সুতরাং সমগ্র মানবজাতির স্বার্থেই বিজ্ঞানকর্মীরা নীরব থাকতে পারেন না।

তাই আমি আপনাকে আপনাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে সোচ্চার প্রতিবাদ গড়ে তুলতে এবং এখানে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতে অনুরোধ করছি।

ইতি
অভিবাদন সহ
(স্বাক্ষর)

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী :
বাৎসরিক চাঁদার হার :—তিন টাকা
„ (সডাক) চার টাকা
নাম, ঠিকানা সহ যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা :
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
C/o. ভি, এস, এণ্টারপ্রাইজেস
৫২/৯/সি বি, বি, গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে অভিজিৎ লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পাদক হিরণ্ময় সাহা কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকপ প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।